গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

গম্ভীরা ঃ অতীত-বর্তমান

গম্ভীরা

১। গম্ভীরার সাধারণ পরিচয়
২। গম্ভীরা ঃ প্রসঙ্গ নামকরণ
৩। গম্ভীরা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত
৪। গম্ভীরার গোত্র : বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত
৫। গম্ভীরার সাতকাহন
৬। গম্ভীরা গান
৭। বর্তমান গম্ভীরার গানের দল
৮। গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য
৯। গম্ভীরার আয়োজক ও দর্শক
১০। গম্ভীরার পূর্ণাঙ্গ দল
১১। গম্ভীরার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণ
১২। গম্ভীরা শিল্পীদের আর্থসামাজিক চিত্র
১৩। গম্ভীরার অঞ্চল
১৪। গ্রন্থসূচী

গম্ভীরা ঃ সাধারণ পরিচয়

'গম্ভীরা' শুধু মালদা বা গৌড়বঙ্গ নয় গোটা বাংলা লোকসংস্কৃতি জগতের এক অপরিহার্য নাম। গৌড়বঙ্গে এর ব্যপ্তি ও বিস্তার হলেও অবিভক্ত মালদা জেলা-ই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। 'গম্ভীরা' — আদি শৈব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেও বর্তমানে সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের এক মহা মিলন ক্ষেত্র। যদিও গম্ভীরা ধর্মীয় সংস্কৃতির আচার কেন্দ্রিক এক নিষ্ঠাবান অনুষ্ঠান। 'গম্ভীরা গান' কিন্তু তা নয়। গৌড়বঙ্গ সহ গোটা বঙ্গ সংস্কৃতিতে এই 'গম্ভীরাগানে'র বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

আবার গম্ভীরাগান নৃত্য-গীত সহযোগে এক শ্রেণীর বিশেষ লোকনাট্যও।

'গম্ভীরা' তে আছে বিশেষ পূজাপাঠ, আচার-অনুষ্ঠান সহ মাঙ্গলিক নানাবিধ অনুষ্ঠান। আর গম্ভীরা গানে আছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সহ একাধিক পালাগান। পূর্বে গম্ভীরা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই গানের আসর বসত বলে গম্ভীরা গানের এই রকম নামকরন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আদিতে গম্ভীরার মূল অনুষ্ঠান ছিল ৫ দিন। যথা — ঘটভরা। ছোট তামাসা, বড় তামাসা, আহারা এবং চড়কপূজা — পাঁচদিনে, এই পাঁচটি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হত।

সাধারণত ৩০ দিনে চৈত্রমাস হলে দিনাঙ্কের ক্রমপর্যায়ে ২৬ শে চৈত্র — ঘট ভরা, ২৭ শে চৈত্র — ছোট তামাসা, ২৮ শে চৈত্র — বড় তামাসা, ২৯ শে চৈত্র আহারা এবং ৩০ শে চৈত্র চড়কপূজা। এই দিনগুলিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের গানবাজনা অনুষ্ঠানাদি সংগঠিত হয়। এবং অনুষ্ঠানের ৪র্থ বা ৫ম দিনে বোলাই বা বোলবাই নামে এক ধরণের নাট্যগীতি পরিবেশিত হয় যা খুবই জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় বোলবাই গানই গম্ভীরাগানে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে বর্তমানের গম্ভীরাগানে পূর্বের গম্ভীরার ধর্মীয় আচার অনেকাংশ লোপ পেয়ে শুধুমাত্র গানে ও নাচে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

এই গম্ভীরা গানেরই আবার বেশ কয়েকটি উপবিভাগ ও রয়েছে। যেমন — আসর বন্দনা (মুখপাদ), শিববন্দনা, ডুয়েট, চারইয়ারি, টনটিং, রিপোর্ট অথবা সালতামামী এবং পালাগান। এগুলি অভিনিত হয় মূলত গীতি ও নৃত্য সহযোগে। নাটক বা যাত্রার মত এবং নির্দিষ্ট কোন স্ক্রিপ্ট থাকে না। থাকে শুধু গানের পদ। অভিনেতাদের শারিরিক ভাষার বোঝা লড়াই নাট্যের রূপদান করে। দর্শকাসনে সাধারণ মানুষ খুব আবেগ ঘন অবস্থায় গম্ভীরাগানের পরিবেশন উপলব্ধি করে। গম্ভীরা হাস্য কৌতুক মিশ্রিত বুদ্ধিদীপ্ত অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী এর রস্বাসাদন করেছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে রাজরোষকে উপেক্ষা করেও এই গান পরিবেশিত হয়েছে। কেউ কেউ জেলও খেটেছে গম্ভীরার জন্য।

গম্ভীরা ঃ প্রসঙ্গ উৎস ও নামকরণ

'গম্ভীরা' শব্দের উৎস ও নামকরণ নিয়ে গবেষক মহলে নানা রকম মতবাদের প্রচলন আছে। কেউ কেউ পূর্ববর্তী গবেষকদের দেওয়া তথ্য ও যুক্তি পুরো মেনে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছেন কখনও কখনও। আবার কখনো গবেষক তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করায় সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে গম্ভীরার মূল উৎসবের থেকে 'গম্ভীরাগান'-র কিছুটা স্বতন্ত্রতা আছে। এবার নিচে আমরা লক্ষ্য করব 'গম্ভীরা' শব্দের উৎস এবং নামকরণের তাৎপর্য—

গম্ভীরার আদি ও সর্বপ্রথম গবেষক মাননীয় শ্রী হরিদাস পালিত মহাশয়। যুগধর্মের চাপে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ। স্বদেশী শিক্ষালয় গড়ে তোলার বনিয়াদ এই পর্ষৎ থেকেই শুরু হয়েছিল। এই সময় ১৯০৭ সালে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি তৈরি হলে বিনয় কুমার সরকার মালদার লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিক্ষা নিয়ে স্বদেশী মহোৎসব শুরু করলেন। ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ন মাসে তিনি 'মালদহ সমাচার' পত্রিকায় গম্ভীরার গবেষণা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও তাতে কেউ সাড়া দেননি। এরপর তিনি আবার ১৩১৫ সনের জৈষ্ঠ মাসে পুণরায় বিজ্ঞাপন দিলে শ্রী হরিদাস পালিত মহাশয় যোগাযোগ করেন এবং গম্ভীরা গবেষণার ভার গ্রহণ করেন। ফলে শ্রী পালিত মহাশয়ই গম্ভীরার আদি লেখক ও গবেষক। তাঁর বইটির নাম — 'আদ্যের গম্ভীরা'। গ্রন্থে তিনি গম্ভীরা এবং শৈব সংস্কৃতি নিয়ে দেশ-বিদেশের উদাহরণ সহ পর্যালোচনা করেছেন বিস্তারিত ভাবে। কিন্তু এখানে আমাদের সে উদ্দেশ্য নয়। আমরা এখানে শুধু দেখানোর চেষ্টা করব যে, তিনি গম্ভীরা শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে কি বলেছেন —

'গম্ভীর' অর্থে শিব এবং 'গম্ভীরা' অর্থে শিবালয় কে বুঝিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া যুক্তিগুলি নিচে তুলে ধরা হলো —

"রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে 'আদ্যের গম্ভীরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ... পূর্ব্বাকালে চণ্ডী-মন্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে এতদঞ্চলে গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত।"[১]

—এছাড়া তিনি রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গীতে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে সেকালে গম্ভীরা

বলতে ঐ শ্রেণীর গৃহবিশেষই বুঝাইত। ধর্ম সংক্রান্ত কোন গৃহ।

"দুই দুতে বান্ধী রাণী থুইল গম্ভীরে।।"

"গম্ভীরে বসিয়ে যোগী ধ্যানেতে জানিল।"

"হাড়িপা গম্ভীরে বসি ধ্যানে দিল মন।।"

"আপনার কায়া ছাড়ি গম্ভীরে রাখিয়া।

মায়া পাতি জাত্রা কৈল দৈবজ্ঞ হইয়া।।"[২]

রাঢ় দেশের উল্লেখ করে তিনি আরও দেখাতে চেয়েছেন সেখানেও গম্ভীরা বলতে শিবালয়ই ধরা হয়। বর্ধ্বমান জেলার কুড়মন গ্রামের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন এভাবে —

"গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।

তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম।।" [৩]

এছাড়া পঙ্কজ বা পদ্মফুল অর্থ ধরে তিনি বলেছেন —

"পূর্বে শিবালয় গম্ভীর বা পঙ্কজ দ্বারা শোভিত হইত। ইহাই তাহার গম্ভীরা নামোৎপত্তির অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং 'গম্ভীর' শোভিত 'গম্ভীর' মধ্যে 'গম্ভীর' দেবের পূজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম গম্ভীরা — উৎসব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গম্ভীরা হওয়াই সম্ভব।"[৪]

শিব সংহিতার একটি পংক্তি সর্বশেষ উল্লেখ করে তিনি শিব বিষয়ক উৎসব অনুষ্ঠান বা মণ্ডপের কথাকেই সমর্থন করেছেন এভাবে

"যুগাদিকৃদ্‌যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ।"[৫]

মাননীয় শ্রী হরিদাস পালিত মহাশয়ের পরে গম্ভীরা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন (প্রায় চার দশক) প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ মহাশয়। তিনিও গম্ভীরা সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র মতের কথা প্রকাশ করেছেন গম্ভীরা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলি এবং তাঁর একাধিক গ্রন্থে। তিনি 'গম্ভীরা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই মাননীয় পালিত মহাশয়ের যুক্তিকে কিছুটা খণ্ডন করার চেষ্টা করে বলেছেন — "আসলে মন্দিরের সঙ্গে এ শিবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়

না।"[৬]

তাঁর মতে "এটি আদতে সূর্য পূজা। ধর্মঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হত এবং কোন সময় সেই পীড়িকেই হয়ত ধর্ম বলে পূজা করা হত, তাই 'গম্ভীরী' থেকে গম্ভীরা এসেছে এ কথা মনে করা যেতে পারে।"[৭]

এবং সব শেষে ড. ঘোষের ধারণা — "সূর্যপূজা শৈবধর্মের প্রভাবে ... গম্ভীরা নাম নিয়েছে।"[৮]

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' 'গম্ভীরা শব্দের অর্থ খুব স্পষ্ট নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।[৯]

সংসদ বাংলা অভিধানে গম্ভীরা শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে —

(১) "প্রধানত মালদহের গাজনের উৎসবে শিবার্চনা সম্বন্ধীয় সংগীত নৃত্যের অনুষ্ঠান বিশেষ।"[১০]

(২) দেবমন্দিরের অভ্যন্তর (পুরীর গম্ভীরা)[১১]

এছাড়া আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় আইহোর ঁসতীশ গুপ্তের বাড়ি থেকে পাওয়া (যিনি এককালে বিখ্যাত গম্ভীরা গায়ক ও দল পরিচালক ছিলেন) অংশ দেখতে পাই শিবগড়া বন্দনায় এভাবে

"কোথায় হৈতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি,
আহার নাই, পানি নাই, আইসো নিতি নিতি।
জল নাই, স্থল নাই। সকল শূন্যাকার
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার
.... শিবনাথ কি মহেশ।"[১২]

বলা বাহুল্য এই শিবগড়া বন্দনায় শূন্য পূরানের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত। এছাড়া অন্য আরও একটি পদে আরও স্পষ্ট করে লক্ষ্য করি -— গম্ভীরার উৎপত্তির ইতিকথা

"কাউসেন দত্তের ব্যাটা নয়ন সেন দত্ত
যে জন আনিলা পৃথিবীতে মহেশ্বর ব্রত
তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ শত শত
শিব বসাইয়া দিল গম্ভীরা ভিতরে
শিব বালাভক্তসন সবে নৃত্য করে।
... শিবনাথ কি মহেশ।[১৩]

ড. পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন — "সামগ্রিকভাবে শিবপুজোর জন্য জড়িত যা কিছু তার সবটাই গম্ভীরা নামে আখ্যাত।"[১৪]

ড. শচীন্দ্রনাথ বালা — "শিবের একনাম গম্ভীর। শিবকে উদ্দেশ্য করে কিংবা শিবকে সামনে রেখে এ গান গাওয়া হয়। খেটে খাওয়া শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত-নির্যাতিত সাধারণ মানুষ তাঁদের দুঃখ-বেদনা-কষ্টের কথা এবং অভিযোগ তুলে ধরেন শিবের সামনে। এই শিব পুরানের শিব নন। গণদেবতা। মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন এবং নিরসনের চেষ্টা করেন। মানব দরদী এই শিব মানুষেরই প্রতিভূ ... তাই শিবকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া গীতকে বলা হয় গম্ভীরা।"[১৫]

আর্য চৌধুরীর মতে — "গম্ভীরাকে কেউ 'সাহি' গানও বলে। জলপাইগুড়িতে বলে 'গম্ভীরা'।[১৬]

প্রখ্যাত নৃত্যবিদ শ্রীমণি বর্ধন বলেন —

"গম্ভীরা হচ্ছে গ্রামের সর্বজনীন মণ্ডপ, যেখানে গ্রামের বারোয়ারি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, ... গম্ভীরার অর্থ প্রকেষ্ঠ। আবার উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে সাময়িক বাঁধা চালাঘরকেও বোঝায় গম্ভীরা।"[১৭]

এছাড়া আরও কয়েকটি মতামত গম্ভীরা শব্দের সাথে প্রচলিত — (ক) গ্রাম্য দেবতার স্থান (খ) জগন্নাথ দেবের শয়ন মন্দির (গ) শিবের মন্দির, গাজন ঘর, গাজন উৎসব (ঘ) পুরীধামে কাশী মিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান, নিভৃত গম্ভীর প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান,

তার ভিতরের ক্ষুদ্রগৃহ।[১৮]

বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে, গম্ভীরা অর্থে শৈব কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান এবং তৎসহ বিভিন্ন বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের সমষ্টিগত বিষয়ের নাম ও অর্থ গম্ভীরা।

গম্ভীরা গোত্র ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত

গম্ভীরা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন গবেষকদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানা রকম মতবাদ লক্ষ্য করেছি। মূলত গম্ভীরার আচার এবং গানকে কেন্দ্র করে। এবার আমরা সেই সমস্ত গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত দেখে নেবার চেষ্টা করব যে তারা গম্ভীরা গোত্র সম্পর্কে কি বলেছেন —

মাননীয় শ্রী হরিদাস পালিত মহাশয়ের মতে গম্ভীরা হল —

"রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে "আদ্যের গম্ভীরা" নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। ... সুতরাং গম্ভীর শিবের একটি নাম। এমতও হইতে পারে 'গম্ভীর' নামক শিবের উৎসব যে স্থানে অনুষ্ঠিত হইত সেই স্থানের নাম গম্ভীরামণ্ডপ হইয়াছে .... ।"[১৯]

গম্ভীরার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রথিতযশা খ্যাতিমান অধ্যাপক বিনয় সরকার পুড়াটুলি এবং জামতল্লির গম্ভীরা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই গম্ভীরা গবেষণার ভার অর্পন করেছিলেন হরিদাস পালিত মহাশয়ের উপর। তিনি সে ভার নিয়ে রচনা করেন 'আদ্যের গম্ভীরা'। তারই ইংরেজি অনুবাদ অধ্যাপক সরকার করে নাম দেন — "The Folk Element in Hindu Culture" বইটি ইউরোপের প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরিতে তখন সংগৃহিত ছিল। তা নিজে চোখে দেখেছেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

" ... নানা দেশের বড় বড় লাইব্রেরীতে এই বইয়ের এক একটা কপি দেখেছি। যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে, আর তখনই পেয়েছি বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি — এ আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্‌বিজয়। মনে হয়েছে — এ আমার পুড়াটুলির দিগ্‌বিজয়। কল্পনা করেছি — এ আমার, এই আমার মালদহের দিগ্‌বিজয়"।[২০] বলা বাহুল্য তিনি হিন্দু লোকসংস্কৃতি বুঝিয়েছেন।

ড. ফণী পাল গম্ভীরা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন —

"গাঙ্গেয় ও মধ্যপশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে গম্ভীরা অঞ্চলানা। বলা বাহুল্য লোক সঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির প্রচলিত তিনটি অঞ্চলনার মধ্যে গম্ভীরার বিস্তৃতি ও গুরুত্ব সর্বাধিক।"[২১]

মালদহের বিশিষ্ট ব্যক্তি সাত্যকী চক্রবর্তীর মতে — "গম্ভীরা মালদহের প্রাণের স্পন্দন।"[২২]

মতিলাল কিস্কু, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রাক্তন সচিব গম্ভীরাকে — "বাংলার লোকনাট্যের একটি বিশেষ নাট্যধারা এবং আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক উৎসব বলে বর্ণনা করেছেন। "[২৩]

উক্ত গ্রন্থে গম্ভীরা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে সঞ্জায়িত করেছেন ড. পুষ্পজিৎ রায় এভাবে —

"গম্ভীরা বলতে সাধারণ সবাই গম্ভীরা গানের কথা বা গম্ভীরা পালাগানের কথাই ভাবেন। কিন্তু গম্ভীরা মানে শুধু গম্ভীরাগান নয়, গম্ভীরা বলতে গম্ভীরা গান সহ আনুসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক সমস্ত আচার অনুষ্ঠান মিলিয়ে গম্ভীরা উৎসবকেই বোঝায়। তাই গম্ভীরা শুধু নাচ গান নয়, সামগ্রিকভাবে একটি ঐতিহ্য মণ্ডিত উৎসব — অনুষ্ঠান, নানান রকমের আচার-আচরণ-বিধি বিধান, মেলা, চড়ক, ছদ্মবেশ ধারণ, মুখানাচ — এইসব মিলিয়েই গম্ভীরা।" [২৪]

ড. প্রদ্যোত ঘোষ গম্ভীরাকে — 'লোকসঙ্গীত ও লোকউৎসব' [২৫] বলে বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে।

আবার আর এক খ্যাতিমান ও যশস্বী মাস্টার মশাই ড. তুষার কান্তি ঘোষ গম্ভীরা গানকে — "শৈবসংস্কৃতির প্রভাবযুক্ত গীতিমূলক লোক নাটক বলে মনে করেন।"[২৬]

ড. শচীন্দ্রনাথ বালা তার গবেষণা গ্রন্থে গম্ভীরা সম্পর্কে জানাচ্ছেন — "মূলত গম্ভীরা গানই সাংবাদিকতার কাজ করে। তাই গম্ভীরা লোকসাংবাদিকতার মাধ্যমে লোকনাট্য"[২৭] বলা যেতে পারে।

ড. ফণী পাল অন্য এক স্থানে গম্ভীরা সম্পর্কে বলেছেন —

"শিব-ধর্ম-সূর্য দেবতাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে সংস্কৃতি চর্চা গড়ে উঠেছিল গঙ্গার উভয় উপত্যকা অঞ্চলে কালক্রমে তা গম্ভীরা নামে পরিচিত হয়েছে। বহু প্রাচীন এ লোকসংস্কৃতি হল গম্ভীরা।"[২৮]

গম্ভীরা চর্চার সঙ্গে যুক্ত পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শ্রী শচীকান্ত দাস গম্ভীরাকে — "দেবাদিদেব মহাদেবের গানই গম্ভীরার মূল বিষয়বস্তু"[২৯] বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিখ্যাত নৃত্য বিশারদ মণি বর্ধন গম্ভীরা সম্পর্কে বলেছেন —

"শিবেরই অন্য নাম গম্ভীরা। গম্ভীরার উৎসব কাল বৈশাখ মাস।... মহানন্দার উভয় তীরবর্তী গ্রাম সমূহের আবালবৃদ্ধবনিতা এই গম্ভীরা উৎসবে মেতে উঠেন। বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনার রাজনৈতিক, সামাজিক, দুর্নীতি, শ্লেষাত্মক গানে বর্ণিত হয়, রূপায়ন চলে নৃত্য গীতে। কখনও বা 'পণ প্রথা', 'চারইয়ারি', 'নয়া পয়সা' রেশন অফিসারের প্রতি। ইত্যাদি নামে খণ্ড খণ্ড শ্লেষাত্মক নাটিকা নৃত্য-গীত, অভিনয়ে সংলাপরূপায়িত।"[৩০] ঘটনার নাম গম্ভীরা।

অতসী নন্দী গোস্বামী আলকাপের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে গম্ভীরা সম্পর্কে বলেছেন —

"গম্ভীরার শিবদুর্গার সামনে প্রণয় কলহ, কাপট্য, ছলনা প্রভৃতি নিয়ে কলহ-কৌতুক তাইই তার প্রধান উপজীব্য।"[৩১]

মীর রেজাউল করিম গম্ভীরা সম্পর্কে বলেন —

"আদিতে গম্ভীরা ধর্মীয় উৎসব হলেও বিবর্তনের পথে তা ধীরে ধীরে ধর্মীয় খোলসমুক্ত সাধারণ লৌকিক উৎসবের পরিনত হয়েছে।"[৩২]

— উত্তরবঙ্গের লোকগান, সম্পাদক - রতন বিশ্বাস, পৃ - ৬৭৯

প্রাক্তন আমলা ও বিশিষ্ট্য গবেষক শ্রী অরুণ কান্তি ভট্টাচার্য গম্ভীরা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে

বলেন — "গম্ভীরা মালদহের প্রাণের উৎসব। জাতীয় উৎসব। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে হিন্দু-মুসলমান, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জেলার প্রতিটি মানুষ তাই অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন। "[৩৩]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক ওকিল আহমদ গম্ভীরা সম্পর্কে বলেন — "গম্ভীরা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জের প্রচলিত একটি লোকপ্রিয় গান। বর্তমানে এগানের বিষয়বস্তুতে ধর্মের কোনো স্থান নেই। সম্পূর্ণ সেকুলার ও বিনোদনমূলক লোকসঙ্গীত।"[৩৪]

অন্য আর এক প্রাক্তন সরকারী আমলা পুলকেন্দু সিং গম্ভীরা সম্পর্কে বলেন — "গম্ভীরা লোকনাট্যের আঙ্গিকে নৃত্য বাদ্য অভিনয় সংলাপ এর মধ্য দিয়ে ভোলা বা শিবকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। বন্দনা, ডুয়েট, চার ইয়ারি ইত্যাদি বিষয়গুলি গম্ভীরা লোকনাট্যে তাৎক্ষণিক সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়। সবশেষে পরিবেশিত হয় — রিপোর্ট অংশ যেখানে সরস ঢঙ্গে স্থানীয় বিশেষ ঘটনার সাম্প্রতিক বিচরণ প্রদান করা হয়। গম্ভীরা গান সমাজ সচেতনতার গান।"[৩৫]

গম্ভীরা সম্পর্কে বিশিষ্ট্য গবেষকদের উক্তি এবং গম্ভীরা চর্চা কারি ব্যক্তিদের কাছ থেকে গম্ভীরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যা মতামত পেলাম তা দেখে বুঝেনিতে অসুবিধা হয় না যে, — গম্ভীরা গান আসলে প্রাচীন যাত্রার আদলে রঙ্গ-ব্যাঙ্গ ঠাট্টা মিশ্রিত নৃত্য গীত সহযোগে এক শ্রেণির লোকনাট্য।

গম্ভীরার সাতকাহন

(১) আদ্যের গম্ভীরা (২) গম্ভীরা গান

(আদ্যের গম্ভীরা মূলত গম্ভীরার পূজা পদ্ধতি, গম্ভীরার গান সাধারণত গম্ভীরাগানের বিভিন্ন পর্যায় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি গম্ভীরা এবং গম্ভীরাগান মোটেই এক নয়। বরং মূল গম্ভীরার একটি আঙ্গিককে কেন্দ্র সেই নির্দিষ্ট দিনের আচার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের বাইরের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের নাম গম্ভীরাগান নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

এবার আমরা আদ্যের গম্ভীরা বা মূল গম্ভীরা নিয়ে পর্যালোচনা করব।

গম্ভীরা মূলত শৈব সংস্কৃতিমূলক উৎসব। সমাজের প্রায় সব স্তরের লোকেরা এই গম্ভীরা উৎসবে অংশগ্রহণ করলেও অহিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তেমনভাবে যোগদান করে না। এমনকি পূর্বে উচ্চ শ্রেণীরও তেমন গতায়ত দেখতে পাওয়া না গেলেও বর্তমানে যথেষ্ট অংশগ্রহণ দেখা যায় তাদের। অঞ্চলভেদে গম্ভীরা উৎসবে বিভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়েছে যেমন — কোথাও শিবের গাজন। কোথায় ধর্মের গাজন, কোথাও গাজন, কোথাও সাহীযাত্রা প্রভৃতি।

সাধারণ প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গম্ভীরা থাকে। তবে দলাদলি বিবাদের ফলে একাধিক গম্ভীরাও তৈরি হতে পারে। এমনকি একটি সম্প্রদায়ের জন্য একটি আলাদা গম্ভীরার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সবগুলি গম্ভীরার প্রধান গম্ভীরা বা আদি গম্ভীরাকে বলা হয় "ছাত্রিশী গম্ভীরা।" বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে গম্ভীরা বলতে দেবকুঠি বা চণ্ডিমণ্ডপের ন্যায় গৃহকে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়া মূল গম্ভীরার অনুষ্ঠানকে মোট পাঁচ দিনে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠান মূলত ধর্মাচার কেন্দ্রিক যাগযজ্ঞ ও পূজাপাঠের মাধ্যমে নিষ্ঠাকারে পালিত হয়ে থাকে। সাধারণত চৈত্রমাসে এই গম্ভীরা উৎসব হয়ে থাকে। ৩০ চৈত্র সংক্রান্তি হলে ২৬ তারিখ থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এবং সংক্রান্তি যদি ৩১ শে চৈত্র হয় তাহলে অনুষ্ঠান পর্ব একদিন করে পিছিয়ে যায়। অর্থাৎ ২৭ শে চৈত্র থেকে শুরু হয় গম্ভীরা উৎসব।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট পাঁচ দিনে পাঁচ রকমের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়ে থাকে

সুচারু ভাবে। এবং প্রত্যেকদিনের জন্য নির্দিষ্ট বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে। নিচে গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন আঙ্গিক একবার দেখে নেওয়া যাক।

২৬ শে চৈত্র - ঘটভরা

২৭ শে চৈত্র - ছোট তামাসা

২৮ শে চৈত্র - বড় তামাসা

২৯ শে চৈত্র - আহারা

৩০ শে চৈত্র - চড়ক পূজা

এবার অনুষ্ঠানগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখা যাক উপরিউক্ত অনুষ্ঠানগুলি কি ভাবে সম্পাদিত হয় —

ঘটভরা

অঞ্চল বিশেষে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের নিয়মের প্রবর্তনা। তাই কোথাও কোথাও তিন দিন, কোথাও কোথাও ৫ দিন কোথাও ৭ অথবা ৯ দিন আগে ঘট ভরা হয়। গম্ভীরার মূল সন্ন্যাসী ঘটভরতে সাহায্য করেন। এই পদ্ধতি কখনো কখনো পুরুষানুক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আগে এই দিনের থেকেই ভক্তগণ প্রথানুসারে সকল নিয়ম অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও বর্তমানে আর তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এবং এই দিন থেকেই গম্ভীরা মণ্ডপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন শুরু হয় নিয়মিত ভাবে।

পূর্বাকালে এই ঘটভরা-র দিনে সমবেত একটি মিটিং বসত এবং তাতে ঐ দিনের সমস্ত ঘটনা নির্ধারিত হবার পরে মণ্ডল প্রধান বা মোড়লের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কাছাকাছি কোন বড় জলাশয় থেকে পরিস্কার জল এনে ঘটভরা প্রথা পালন করা হয়। অর্থাৎ ঐ দিনে গম্ভীরা গৃহে ঘটস্থাপন করা হত। ঘটভরার প্রাক্‌কাল থেকে ঘটস্থাপন পর্যন্ত ঢাক-কাশি বাজতে থাকে অবিরত ভাবে। ঘটস্থাপন হয়ে গেলে সাধারণত ঐদিন আর কোনও কাজ থাকে না।

আবার কোথাও কোথাও "দু সারিতে জল পূর্ণ ঘট সাজিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

করাও হয়।”[৩৬] এই প্রথা এখনও ক্ষীণভাবে বর্তমান।

ছোটতামাসা

সাধারণত ছোট তামাসার দিন কোন প্রকার উৎসব অনুষ্ঠান থাকে না। কেবলমাত্র হরপার্বতীর পূজা আরম্ভ হয় এদিন। শিবের কাছে যারা মানত করে তাদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তদের মধ্যে বেশিরভাগই বালক বলে এদের বালকভক্ত বলা হয়।

বালকভক্তগণ সারিবদ্ধভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে শিবগড়া বন্দনা পাঠ করতে হয়। বন্দনা পাঠকালে ভক্তগণকে একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দনা এক এক অংশ উচ্চারিত হবার পর এক পায়ে ভর করে দু পা সামনে লাফিয়ে গিয়ে আবার পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে হয়। ‘এক একস্থানের শিবগড়া বন্দনা একএক রকম হলেও মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এক।’[৩৭]

সাধারণত এই অনুষ্ঠানটি ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যা বেলাতে হয়ে থাকে। প্রধান ভক্ত বালাভক্ত সহ অন্য ভক্তদের বেত হাতে করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে এই বন্দনা প্রক্রিয়া সমাধা করেন। নিচে শিবগড়া বন্দনার দুটি পদ উল্লেখ করা হলো —

(১) “কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি।।
জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার।।
— শিবনাথ কি মহেশ।”[৩৮]

(২) বাণ নাচে রক্ত গায়ে বাহুহীন হৈয়া।
শিব তুষ্ট হৈলেক সাঙ্গপাঙ্গ লৈয়া।
শিবের দুরন্ত ভক্ত বান মহারাজ।
কাল ভৈরব হৈয়া মিলি গেল আজ।।
শঙ্কর সঙ্গেতে সাথী কৈলাসেতে ধাম।
তাহার চরণে করি দ্বাদশ প্রনাম।।”[৩৯]

ড. প্রদ্যোত ঘোষ তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে শিবগড়া বন্দনার কয়েকটি অংশের কথা বলেছেন —

ক) সৃষ্টি প্রকরণ, আবাহন

খ) শূন্যঅকারে ধর্মস্থিতি, পৃথিবীর জল কথা, কূর্ম

গ) দেহশুদ্ধি, মুখশুদ্ধি

ঘ) মন্দিরশুদ্ধি

ঙ) জীবনসৃষ্টি

চ) কপিলা গমন

ছ) দেবগণের সমুদ্রবন্ধন। দ্রব্যবন্টন

জ) গম্ভীরা বন্দনা

ঝ) দেবতা আহ্বান।"[৪০]

বড় তামাসা

গম্ভীরা উৎসবের তৃতীয় দিনকে বলা হয় বড় তামাসা। সকল গম্ভীরা মণ্ডপে এই উৎসব হয় না। বর্তমানে কেবলমাত্র আইহো এবং পুরাতন মালদায় অবশিষ্ট আছে। এদিন হরগৌরির পুজার পর ভক্তগণকে নিয়ে (শুধুমাত্র পুরুষদের) নিয়ে শোভাযাত্রা করার রেওয়াজ। সঙ্গে চলে ঢাকের বাদ্য। এই বিষয়টি কেবলমাত্র পুরাতন মালদাতেই হয়ে থাকে। ভক্তগণেরা বহুরূপীর সাজে বের হয় এবং তাদের দেখতে যথেষ্ট জনসমাগম হওয়ার ফলে স্থানটি মেলার আকার ধারন করে। সাধারণত "ভূত, পেত্নী, বাজীকর, বাজীকর-স্ত্রী, সাঁওতাল, তুবড়ীওয়ালা প্রভৃতি বেশ ধারণ করে।"[৪১]

এছাড়া ছিল মুখা নাচ এবং সঙ্গে — "কেহ কেহ ত্রিশুলাকৃতির ক্ষুদ্রবান উভয় বক্ষঃপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্জ্বলিত করে।"[৪২]

আহারা পূজা

সাধারণত সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ বড় তামাসার পরদিন খুব ভোরে শুরু হয় মশান নৃত্য। 'মশান নাচ' দিয়ে শুরু হয় আহারা।

মশান নৃত্য হয়ে গেলে শুরু হয় হর-পার্বতীর পূজা। পূজা ও হোম শেষ হলে কুমারী মেয়ে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। পূজায় সাধারণত দেখা যায় এক টুকরো বাঁশ বা কঞ্চির আগায় কলার মোচা আম বেল প্রভৃতি ফল ঝুলিয়ে মাত্র পাঠ শেষ হলে আহারা পূজার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

"এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ অথবা আদিম ঐন্দ্রজালিক আন্তচার বিশ্বাসের কিছু মিশ্রণ লুকিয়ে আছে সন্দেহ নাই। কৃষি উৎসব উর্বরাশক্তির পরিচয়বাহী। শৈব বিবাহ তারূপক। তাহারা অনুষ্ঠানে তাহারই রূপক মেলে।" মালদার লোকসংস্কৃতিবিদেরা এমনই মনে করেন।

এই আহার দিন সন্ধ্যার সময় অন্য আর একটি অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায় কোথাও কোথাও। সেটি হল সামশোল ছাড়া। এদিন সন্ধ্যার সময় একটি ছোট্ট গর্ত খোড়া হয় গম্ভীরার সামনে এবং ভক্তরা সেটি লাফিয়ে পার হয়। ড. পুষ্পজিৎ রায় এই ব্যবস্থাকে "রিচ্যুয়াল পালনের রীতি"[৪৩] বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

এছাড়া 'ঢেঁকিচুমান' নামে আর একটি অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানে ঢেঁকিকে সিন্ধুর লেপ করে গম্ভীরা প্রাঙ্গনে রাখা হয়।

চড়কপূজা

৩০ চৈত্র হয় সংক্রান্তি। এদিনেই চড়কপূজা হয়ে থাকে। স্থানীয় কোন বড় পুকুরে আগে থেকেই চড়কগাছটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এদিন সকাল বেলা সেই পুকুর পাঁড়ে গিয়ে পুজার্চনার ব্যবস্থা করা হলে মূল সন্ন্যাসী জলে নামেন। 'তারকেশ্বর শিব'[৪৪] উচ্চারণ করার পরে এবং চড়কগাছ খুঁজতে থাকেন। কথিত ছিল— চড়কগাছ সহজে ধরা দেয় না। চড়কগাছ ধরা দিলে তাঁকে উপরে তুলে আনা হয় এবং পূজার্চনার পরে চড়কতলায় আনা হয়। তারপর চড়কপূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাধা করা হয়ে থাকে। গাছ পোঁতা, বানফোঁড়, কাঁচামাপ, বটিঝাপ প্রভৃতির মাধ্যমে।

গম্ভীরার মূল উৎসব চৈত্র, বৈশাখ এবং জৈষ্ঠ এই তিনমাসে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। অনুষ্ঠান পরিচালনার সুবিধার্থে গম্ভীরার উৎসব তাই বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান ধার্য থাকে। যাতে সকলে সমবেত ভাবে প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই পুরাতন মালদা,

আইহো, জগদলা, ইংরেজবাজার, গাজোল প্রভৃতি স্থানে এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে এই গম্ভীরার মূল অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার পুরনো জৌলুস অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।

শৈব সংস্কৃতি নিয়ে দেশ বিদেশের নানা রকম অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক আচার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ সহ আলোচনা করে দেখিয়েছেন শ্রদ্ধেয় হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁর আকর গ্রন্থ 'আদ্যের গম্ভীরা' বইটিতে।

পরিশেষে বলা বাহুল্য, আমরা এতক্ষণে যে আলোচনা করলাম তার সবটুকুই 'আদ্যের গম্ভীরা' বা গম্ভীরার মূল আচার নিষ্ঠা কেন্দ্রিক ধর্মীয় প্রভাবের কথা জানতে পারলাম। শেষ দিন 'আহরার' 'বোলবাহি' নামে এক ধরনের নান্দনীক অনুষ্ঠান হয় রাত্রি বেলা। এবং এই গানের স্বতন্ত্র সুর, মুর্চ্ছা, সরকার-রচয়িতা থাকে। ফলে ফলে এর সাথে নানা ধরনের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস মিলিত হয়ে এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের অবেগ ও বুদ্ধির মিশ্রণে মূল গম্ভীরার থেকে গম্ভীরা উৎসবের নান্দনীক অনুষ্ঠানগুলি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বলে 'বোলবাহি' সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে গম্ভীরা গান। বর্তমানে গম্ভীরা গানের চাপে মূল গম্ভীরার উৎসব অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছে।

গম্ভীরা গান

গম্ভীরা সঙ্গীত নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা ধরনের মত পার্থক্য আমরা অগেই দেখেছি। কেউ বা একে লোকনাট্য বলেছেন তো কেউ আবার নাট্যগীতি। আবার কেউ কেউ লঘু হাস্যরসাত্মক নৃত্য ও গীতের পরিবেশন বলে বর্ণনা করেছেন।, কেউ বা যাত্রাধর্মী অনুষ্ঠান বলতেও পিছপা হননি। ফলে গম্ভীরা নিয়ে গবেষকদের একমত হওয়া যে খুব সহজ নয় বলা বাহুল্য। তবে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান ও তার পর্ববিভাগ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য এখনও পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। গম্ভীরাগানের পর্ব বিভাগগুলি মোটামুটি এই রকম — বন্দনাগান, চারইয়ারী, শ্লেষ বা টনটিং, ডুয়েটগান বা দ্বৈতগান ও রিপোর্টিং এছাড়া কখনো কখনো বিষয় ভিত্তিকগান গাওয়া

হয়ে থাকে। নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে গম্ভীরাকে সহজে বুঝে নেওয়া যাক ...

চিত্র - ১

অবশ্য ড. পুষ্পজিৎ রায় তার গম্ভীর গ্রন্থে গম্ভীরাগানকে 'চারটি প্রধান পর্যায়'[৪৫] ভাগ করেছেন। যথা — বন্দনা, চারইয়ারী, ডুয়েট এবং রিপোর্টিং।"

আবার গম্ভীরার অপরখ্যাতিমান গবেষক ড. প্রদ্যোত ঘোষ গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানকে ভাগ করেছেন — "মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ারী, পালাবন্দীগান, খবর বা রিপোর্টিং।"[৪৬]

আমরা আমাদের গম্ভীরা গানের আলোচনায় গ্রহণযোগ্য মতকে কেন্দ্র করেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব। আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় ড. ঘোষের মতকে পরিলক্ষিত করেছি। অর্থাৎ — গম্ভীরা গানের অংশগুলি হল — মুখপাদ বা কনসার্ট, বন্দনাগান, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ারী, পালাবন্দীগান এবং রিপোর্ট বা খবর।

ক্ষেত্র গবেষণায় আমরা দেখেছি গম্ভীরা দল প্রধানরা কেউই এ মতের বিরোধীতা করেননি। দলনেতাদের মধ্যে অরুন বসাক, রবিশঙ্কর ঘোষ, অমর মণ্ডল, প্রশান্ত শেঠ, অসীম সরকার প্রভৃতিরা

উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী অংশে আমরা বর্তমানের গম্ভীরা দলের নাম ঠিকানা, দল প্রধানদের নাম বিস্তারিত উল্লেখ করে দেখাবো। এবার আমরা গম্ভীরা গানের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব —

কোনো বারয়ারিতলা, ফাঁকা মাঠ বা কারও বাড়ির উঠানে যথেষ্ট লোক বসার ব্যবস্থা থাকলেই সেখানে গম্ভীরার আসর বসতে পারে। পূর্বকালে দর্শকাসনের মাঝে ১২/১৪/১৬ ফুটের মত অংশ ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসত। বর্তমানে সে রেওয়াজ নেই। আধুনিকতার ছোয়ায় প্রমান মাপের স্টেজ করা হয় গম্ভীরা গানের জন্য। থাকে গ্রীনরুমও। উপরে প্রয়োজনানুসারে আচ্ছাদন কখনো কখনো থাকে। বাধ্যতামূলক নয়। বসার জন্য ত্রিপল, চট বা খড় ব্যবহৃত হয়।

স্টেজের একদম পিছনের দিকে থাকে যন্ত্রবাদকেরা। তারা সাধারনত হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা এবং জুড়ি বাজায়। "আদিযুগে কেবলমাত্র ছিল ঢোল ও কাশি।"[৪৭] — ইদানিংকালে ফ্লুট, কর্নেট যুক্ত হয়েছে।

বাদ্যকরদের সামনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে এবং দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গায়করা গান করে। কিন্তু প্রথমেই গান হয় না। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে শুরু হয় কনসার্ট।

মুখপাদ বা কনসার্ট

প্রথমে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রগুলি বাদ্যকারেরা টুকটাক আওয়াজের দ্বারা সেটিং করে নেয়। তখন অনুষ্ঠান এলাকার মানুষেরা মাইকে সে সব শব্দ শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। তখন থেকেই সকলের মন ছুটতে থাকে গম্ভীরা আসরে। ছোট বাচ্চারা তখন থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করে।

যন্ত্রগুলি সেটিং হয়ে গেলে ৭ থেকে ১০ মিনিট এক নাগাড়ে বিভিন্ন রকম তালে বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজানো হয় এবং মাইকের মাধ্যমে তা দূর দূরান্তে পৌঁছে যায়। তখন গ্রাম বা এলাকার বড়রা আসতে শুরু করে। একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ এই বাদ্যযন্ত্র বাজানোকে বলা হয় — মুখপাদ বা কনসার্ট। কখনো কখনো ১৫/২০ মিনিটও এই কনসার্ট বাজতে থাকে।

এর পরে অভিনেতরা তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দর্শকদের সামনে গানের কথার মাধ্যমে।

পরিচয়পর্ব শেষ হলে শুরু হয় গম্ভীরার মূল অনুষ্ঠান। অর্থাৎ আসর বন্দনা।

বন্দনাগান

বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন মঞ্চে আসেন। তাঁর ডান হাতে ত্রিশূল, বাঁ হাতে ডমরু। মাথায় জট এবং পরনে বাঘ ছাল। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু ব্যক্তি তাদের দুঃখ কষ্টের কথা অর্থাৎ আর্থসামাজিক ভাবে নিম্নস্তরের মানুষের প্রতিভূ হিসাবে শিবের কাছে বক্তব্য রাখে এবং সব কিছু খুলে বলে।

মহাদেব এখানে রূপক অর্থে উপস্থিত হন। তিনি সবার মঙ্গলাকাঙ্খি। প্রথম যুগে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী দেবাদিদেব মহাদেব হলেও এখানে তিনি শাসক দলের প্রধান মুখ। ফলে তাঁকে স্থানীয় ও দেশের নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার প্রতিকার প্রার্থনাই এই অংশের প্রধান কাজ।

ঐ গানের নির্দিষ্ট কিছু সুর ও ছন্দ আছে। শিবঠাকুর তাদের কথা শুনে তাদের সাহস-ভরসা যোগান এবং আশ্বস্ত করেন যে, সমস্যাগুলি সমাধান করবেন। মঞ্চে অভিনয়কারী সাধারণ মানুষ তাঁকে 'নানা' 'দাদু' বা বুড্ডা বলেও সম্বোধন করে। ঠাট্টা ইয়ারকীও চলে পুরোদমে। শিবকে স্মরণ করে অভাব অভিযোগ করা হয় গানের মাধ্যমে, তাই এই অংশটিকে শিববন্দনা বলে।

আমাদের ক্ষেত্রগবেষণায় 'লুব্ধক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস'-নামের দলপ্রধান রবিশংকর ঘোষ আমাদের জানান — "এই গানে কখনও কখনও শিব ঠাকুরের সাথে তাঁর অনুচর নন্দি বা ভৃঙ্গীকেও আসতে দেখা যায়। কখনও বা পার্বতীও সঙ্গে থাকে।"[৪৮]

শিবের বন্দনা রাজনৈতিক ও সামাজিক দুই হতে পারে। শিববন্দনা গম্ভীরা গানের অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক। রবিশংকর ঘোষ মহাশয় আমাদের আরও জানান — "বাইরের মানুষের কাছে শিব মালদহের 'ব্র্যান্ড' হয়ে গেছে।"[৪৯]

গম্ভীরাগানে শিবকে ডাকা হয় কেন তা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এরকম —

একবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জীর মালদাতে আসার কথা ছিল। তখন স্থানীয় গম্ভীরা গায়ক মোহম্মদ সূফীর খুব নাম ডাক। সিদ্ধান্ত হয় তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে তার সামনে গম্ভীরা সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। কিন্তু কোন একটি কারনে তিনি

সেদিন উপস্থিত থাকতে না পারায় সুফী মাস্টার সিদ্ধান্ত নেয় তার দলেরই একজনকে আশুতোষ (শিবের আর এক নাম) সাজিয়ে গম্ভীরা পরিবেশন করবেন। যদিও আশুতোষ মুখার্জী আসেনিনি কিন্তু তার একজন প্রতিনিধি সেদিন এসেছিলেন।

সেদিনের সুফী মাস্টারের সেই তাৎক্ষনিক বুদ্ধির পরিচয়ে এবং পরিবেশন প্রণালীর অভিনব ভঙ্গিমা এমন চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, তারপর থেকে গম্ভীরাগানে শিব চরিত্রকে উপস্থিত করা এবং তার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করে ফেলে অন্য দলগুলি। তাছাড়া আমাদের মনে হয় পালাটির পরিবেশন পদ্ধতি দর্শকমনে দৃঢ় স্থান করে নেওয়ার ফলে পালাটি দর্শকের চাহিদানুসারে বারবার পরিবেশনের ফলে তা নিয়মে পরিনত হয়ে গেছে। এবং অন্য গম্ভীরা দলগুলিও অধিক বায়না পাবার আশায় শিবের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

আবার এমনও হতে পারে যে দরিদ্র সাধারণ মানুষ তার ছেঁড়া পোষাক নিয়ে অন্য দেবতাদের কাছে আর্তি জানানোর সাহস বা একাত্মতা খুঁজে না পাওয়ার কারনে শিবকে উপস্থিত করে তাদের সমস্ত আবেদন নিবেদনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছে তাই গম্ভীরাগানে শিবের উপস্থিতি লক্ষ্য করি আমরা।

নিচে শিবের বন্দনার উল্লেখ করা হলো ...

(১) "শিব হে দেখনা তিনটা চোখে
দেখনা তিনটা চোখে
বাংলায় মোরা আমরা কি দুঃখে।।

লোকে লাগালো ধান হল পাতান
কল গেল সব শুখে (শুকিয়ে)
মরছি হামরা প্যাটেরই ভূখে।।
— শিব হে ...

বিদেশ থেকে এল লাউয়া হেয়ার কাটিং করতে
ছুড়িগুলো সব মরদ সাজ্যাছে

— শিব হে ...[৫০]

(২) কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায়না অন্ন
হায় কি রে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আটমনের ভাত চাউল হে
কুন্ঠে (কোথায়) গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেরও ভাত জুটে না,
দু বেলা প্যাটে ভাত জুটে না
তোর নন্দী ভিরিঙ্গী বুড্হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পূজবো, কহেক হামরা, শিবহে ।...[৫১]

একটি বন্দনা গান আমরা দল পরিচালক অমর মণ্ডলের কণ্ঠে পেয়েছি ক্ষেত্র গবেষণার কাজে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে একটি গান পেয়েছি। তিনি সেটিকে বিশু পণ্ডিতের গান বলে আমাদের জানিয়েছেন। গানটি হল —

"শিব হে
বড়ো দুঃখে পোড়্যা বলি তোরে,
শুনেক দিয়া কান
বল পশুপতি, এ দুর্গতির
নাই কি অবসান।।
পূর্ণ স্বাধীন হয়েও মোদের দ্যেশ
রইলো না মনুষ্যত্বের লেশ
তাই ঠকবাটপারি, জুয়া চুরি

সব মহলে এক বিধান।।

ভারত এখন সমস্যার মুখে

পাকিস্তান দাঁড়ায়ে রুখে

ওই কাশ্মীর লয়ে বাদী হয়ে

ভুট্যা শুনাই পৈকা গান।।

বিদেশি মুদ্রা বজায় রাখার তরে

সোনার বাজার মূলে দিল সেরে .... "[৫২]

.... ইত্যাদি।

এই পদটি ড. পুষ্পজিৎ রায়ের গম্ভীরা গ্রন্থেও আছে। তিনিও পদটি বিশু পণ্ডিতের বলে উল্লেখ করেন। পরিশিষ্ট অংশে আরও বন্দনা জুড়ে দেওয়া হবে।

চারইয়ারী

গম্ভীরা গানের এই পর্যায়টিতে দেখা যায় 'চার ইয়ার' অর্থাৎ চার বন্ধু মিলে এক বা একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক যে কোন বিষয়ই হতে পারে। চার বন্ধুর তিনজন নির্দিষ্ট এক একটি বিষয়ের পক্ষে বললেও চতুর্থ জন কারও পক্ষেই বলেন না। ইনি স্বতন্ত্র, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সাধারণ বেশভূষায় থাকলে বুদ্ধিদীপ্ত। অন্য তিনজনের যুক্তিকে বার বার খণ্ডন করেন যুক্তির জাল বিছিয়ে। এ ক্ষেত্রেও বিষয় নির্বাচনকে বলা হয় 'মুদ্দা'। মুদ্দা সাধারণত জাতীয়, আন্তর্জাতিক কিংবা রাজ্যস্তরের পলিটিকাল সাবজেক্ট হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য বর্তমানে গণমাধ্যমগুলিতে যে রাজনৈতিক দলের নেতারা সামনাসামনি বসে নিজের দলের ভালো এবং অন্যর গালমন্দ করে, আমরা মালদাবাসী তা অনেকদিন আগেই গম্ভীরার দৌলতে দেখতে পেয়েছি।

এই গান পরিবেশন করতে হলে প্রতিটি শিল্পীকে অত্যন্ত দক্ষ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিদীপ্ত হলেও কেবল চলে না তাকে হতে হয় হিউমার প্রয়োগের যাদুকরের মত। প্রহসন প্রয়োগের উপরও যথেষ্ট

দক্ষতা অর্জন করতে হয়। দুর্বল শিল্পী হলে এই অংশের পরিবেশ ভালো হয় না।

চারিইয়ারী অংশটি ভীষণ মজার এবং উপভোগ্য। জনসাধারণ এই গানে নিজের অবস্থান জানতে পারেন। তবে শিল্পীরা বর্তমানে রাজনৈতিক চাপের ভয়ে এই অংশ সবসময় গাইতে ভয় পাচ্ছেন।

উদাহরণ বা বৈশিষ্ট্য দেওয়া হবে।

টনটিং বা শ্লেষ

গম্ভীরা গানের এই অংশে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় সমাজপ্রভুদের তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রুপের মাধ্যমে বিদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই অংশের গানের সুর বন্দনা বা চারইয়ারী থেকে আলাদা ধরনের। টনটিং এর মুদ্দা সাধারনত প্রশাসনিক দূর্নীতি অথবা সরকারী জনবিরোধী কোনো নীতিকে সমালোচনা করে তৈরি হয়ে থাকে।

কোন আড়তডার হয়তো অবৈধভাবে আড়তে মাল মজুত রেখেছে, পুলিশি প্রশাসন জানা সত্ত্বেও কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মজুতদার ও প্রশাসনের জনবিরোধী নীতিকে এখানে আক্রমণ করা হয়। কোন আধিকারিক ঘুষকান্ডে যুক্ত থাকলে তাকে নিয়ে গান রচনা করা হয়। ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর্যন্ত এই পর্যায়ের গান হয়ে থাকে।

ডুয়েটগান

ডুয়েটগানে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয় থাকে। স্বামী-স্ত্রী, দেওর-বৌদি, জামাইবাবু-শ্যালিকা, দুই বন্ধু, চোর-ডাকাত, শিক্ষক-ছাত্র — প্রভৃতি বিষয়কে দুটি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অংশটি একটু বেশী জনপ্রিয়। কারন সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় থেকে এই বিষয় অনেকটাই স্থূল, হাস্যরসাত্ম হলেও নিম্নরুচী সম্পন্ন নয়। মার্জিত এবং নান্দনিক। ফলে মানুষ রাজনীতি ও সমাজনীতির জটিল তত্ত্ব থেকে সহজ জীবনের কাহিনী অনেক বেশি পছন্দ করে শোনে এটাই একটা প্রধান কারন।

বোঝার সুবিধার জন্য ডুয়েটের একটি অংশ এখানে দেওয়া হল —

(১) "পুরুষ ঃ ওগো বেলার মা, তুমি চল না
ভর্তি করি ইশকুলে তুমাই।
হলেও বয়স ভারি, লেখা পড়ি
শিখতে লজ্জা নাই।।
বয়স্কদের শিক্ষার তরে
গ্রামে গ্রামে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে
(যেন) শিক্ষা পাই সব ঘরে ঘরে
সরকারের টাকায়।।

স্ত্রী ঃ তিন ছেলের মা বয়স কালে
কোন লাজে যাব ইশকুলে
পাড়ার লোকে দেখতে পেলে
হাসবে যে সবাই।।

পুং ঃ শিখতে গেলে লেখাপড়া
বদলে যাবে জীবন ধারা
নিজেই তখন হবা খাড়া
দাঁড়িয়ে নিজের পায়।।

স্ত্রী ঃ এই বয়সে কেমন করে
ইশকুল যাব বাড়ি ছেড়ে
সংসারের কাজ থাকবে পড়ে
করবার লোক কোথায় (আর)।"[৫৩]

রিপোর্টিং বা টপ্পা

টপ্পা বলতে ক্লাসিক টপ্পা গান নয় বরং টপ্পার সুরে গোটা বছরের ঘটে যাওয়া ঘটনার পারম্পর্য দ্রুত লয়ে গেয়ে যাওয়ার নাম টপ্পা হলেও মূলত গোট বছরের রিপোর্ট তুলে ধরাই এর

প্রধান উদ্দেশ্য। স্থানীয় ভাষায় অনেক সময় একে 'চটকা গান'ও বলে। বিশেষ করে স্থানীয় স্তরে ঘটে যাওয়া বিষয় ও সমস্যাগুলি নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। যেমন — পরকীয়া প্রেম, রাস্তাঘাট, শিক্ষক-ছাত্রীর প্রেম বহুবিধ। সারা বছর ঘটে যাওয়া নানা কাহিনী এই গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জানতে পারে। রিপোর্টিং শোনার জন্য দর্শক শ্রোতা অধীর আগ্রহে বসে থাকে। ফলে গম্ভীরা গানেরই এই অংশটি ও অন্যান্য অংশের মত গুরুত্বপূর্ণ। গম্ভীরাগানে দর্শকেরা আদ্যপান্ত সমাপ্ত না করে যান না। আর এখানেই গম্ভীরা গানের স্বকীয়তা। গম্ভীরা গানকে একসময় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যথেষ্ট ভয় করত। কারন, এই গানে ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেওয়া হত।

বর্তমানের গম্ভীরা গানের দল

পূর্বাপর অনেক দলই মালদার গম্ভীরা গানকে বৃহত্তর আমিনায় পৌঁছে দিয়েছে। কালের গতিকে অনেক দল হারিয়ে গেছে, কেউ বা আবার শারিরিক, আর্থিক অভাবে দল পরিচালনা কাজ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কেউ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছে, কেউবা আবার এখনও প্রান্তকায়িত হয়ে রয়েছে কেবলমাত্র ভাল রচয়িতা, অভিনেতা, পরিচালক এবং অর্থের অভাবে। তাছাড়া নতুন প্রজন্ম গম্ভীরা গানের দিকে সে ভাবে আকর্ষণ বোধও করছে না। তবু যে কয়টি দল এখনও ক্ষীণ গতিতে তাদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ধন্যবাদার্হ। বর্তমনা দলগুলির মধ্যেও অনেকেই বেশ খ্যাতি পেয়েছে। কেউ আবার আর্থিক চাপে সেই ভাবে গম্ভীরা গানে মনোযোগ দিতে না

পারলেও আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় যে দলগুলি খুঁজে পেয়েছি তাদের বিস্তারিত একটি সারনি এখানে দেওয়া হল —

ক্র.নং	দল	দলনেতা	এলাকা
১।	ধানতলা গম্ভীরা দল	সুধাকর দাস	ধানতলা
২।	মটর স্মৃতি গম্ভীরা দল	তারাপদ সরকার	সাহাপুর
৩।	পুরাতন মালদহ গম্ভীরা শিল্পী গোষ্ঠী	অরুণ বসাক	ধোপাপাড়া
৪।	লুব্ধক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস	রবিশঙ্কর ঘোষ	পুরাতন মালদা
৫।	বিশ্বনাথ মণ্ডল স্মৃতি গম্ভীরা দল	ভৈরব সরকার	মহদিপুর
৬।	আইহে যাদবনগর লোকসংস্কৃতি সংস্থা	নিতাই চন্দ্র দাস	আইহো, মালদা
৭।	মহিলা স্বয়ম্বর গোষ্ঠী গম্ভীরা দল	কাজল দাস	বুলবুলচণ্ডী
৮।	উপেন মণ্ডলের গম্ভীরা দল	উপেন মণ্ডল	শংকরপুর, গাজোল
৯।	নানা হে গম্ভীরা দল	তপন হালদার	পুরাটুলি, মালদা
১০।	অন্বেষা সাংস্কৃতিক মঞ্চ	অমর মণ্ডল	মানিকপুর, মানিকচক
১১।	অশোকচক্র গম্ভীরা দল	অশোক গুপ্ত	কুট্টিপাড়া, পু. মালদহ
১২।	ফুলবাড়ি গম্ভীরা দল	অসীম রায়	ফুলবাড়ি, মালদা
১৩।	পল্লীকণ্ঠ গম্ভীরা দল	কিশোর রায়	রতুয়া, মালদা
১৪।	গাঙ্গুরিয়া শ্রী শ্রী সারদা তীর্থম গোষ্ঠী	সৌরভ ঘোষ	আশ্রমপুর, পাকুয়া,
১৫।	কুতুবপুর গম্ভীরা দল	প্রশান্ত শেঠ	কুতুবপুর, মালদা
১৬।	ললিতমোন শ্যাম মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের গম্ভীরা দল	তুষার কান্তি ঘোষ বিদ্রোহী সরকার।	মালদা

এছাড়া আরও কয়েকটি ছোট দল গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কখনো সখনো তারা দু একটি অনুষ্ঠানও করে থাকে এই মাত্র। এছাড়া পরবর্তীতে যদি আরও দলের খোঁজ পাওয়া যায় তাও এক্ষেত্রে যোগ করা হবে।

গম্ভীরার পালা

গম্ভীরা সঙ্গীতের পালা একাধিক বিষয়ে হতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি। এছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র গবেষণায় বিভিন্ন গম্ভীরা গানের রচানাকার, দলপরিচালক, গবেষক এবং গম্ভীরা বিশেষজ্ঞ এবং প্রবীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমরা সাধারণত যে বিষয়গুলি জানতে পেরেছি তা হল —

তেভাগা আন্দোলন, একশ দিনের কাজ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বৃক্ষ রোপন, রেল দুর্ঘটনা, এইডস্ সংক্রান্ত সচেতনতা, সতর্কতা ও প্রতিকার, নাইটস্কুল, ক্রেতা সুরক্ষা, নারী প্রগতি, স্বাক্ষরতা প্রসার, জনস্বাস্থ্য, অশিক্ষার ফল, রাজনৈতিক মহাজোট, সর্বশিক্ষা অভিজান, পণপ্রথা, প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর গম্ভীরা গানের পালা রচিত হতে পারে।

গম্ভীরা গানের আসর

পূর্বে গম্ভীরা গান অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক থাকার ফলে চৈত্র, বৈশাখ এবং জৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু এখন প্রায় সারা বছর গম্ভীরা গান কোথাও না কোথাও হতে থাকে। পূর্বে মঞ্চের ব্যবহার না থাকলেও বর্তমানে প্রমান সাইজের মঞ্চেই পরিবেশিত হয়। খেলার মাঠ, বারোয়ারিতলা, কারও বাড়ির উঠানে পর্যন্ত স্থান থাকলেও হতে পারে। সঙ্গে ছোট্ট এক টুকরো গ্রীনরুম থাকা আবশ্যক। মঞ্চ দর্শকাসনের মাঝখানে নয়, দর্শক-অভিনেতা সামনা সামনি বসে। পূর্বে হ্যাঁচাক, ঝাড়বাতি, প্রভৃতি ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লাইট বালবই ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুতের অভাবে জেনারেটর চলে অর্থাৎ আধুনিকতার ছোয়া গম্ভীরা সঙ্গীতে যথেষ্ট লেগেছে।

গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে এবং নিজস্ব ক্ষেত্র গবেষণার অভিজ্ঞতায় পাওয়া গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য নিচে —

(১) গম্ভীরা গানের নির্দিষ্ট কোনো পালার লিখিত রূপ থাকে না। কেবল থাকে মৌখিক একটা কাহিনী। এছাড়া কেবলমাত্র গানের লিখিত রূপ থাকে। ফলে চরিত্রগুলি রচনা এবং কাহিনীর সংলাপ নিজেরাই তৈরী করে মুখে মুখে।

(২) গম্ভীরা গানে শিবের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক। কারণ গম্ভীরা গানে শিব এখন ব্র্যান্ড।

(৩) গানগুলি মূলত রচিত হয় আঞ্চলিক মালদার ভাষায়। তবে বাইরে কোথাও আমন্ত্রণে গেলে মার্জিত বাংলা ভাষাতেই পরিবেশিত হয়।

(৪) দলনেতা তার নিজের ভালোলাগার তাগিদে দল গঠন করেন অথবা অন্য দলের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। আনুসঙ্গিক খরচ তাকেই বহন করতে হয়।

(৫) পোশাক পরিচ্ছদ তেমন নজর দেওয়া হয় না। ছেড়াকাপ, ছেড়া ধুতির ব্যবহৃত হয়।

(৬) খড়িমাটি, চুন, পরচুলা সাধারণ মেকাপ ব্যবহৃত হয়।

(৭) গম্ভীরাতে হিউমার বেশি, সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় হাস্যরসের সৃষ্টি।

(৮) পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের দীর্ঘতা - ৩ থেকে ৪ ঘন্টা।

(৯) মাটিতে এবং বাঁধানো মঞ্চে দু স্থানেই গম্ভীরা গান হতে পারে।

(১০) আধুনিক কালে সাজঘরের প্রয়োজন বেড়েছে, পূর্বে তেমন ছিল না।

(১১) অভিনেতা-দর্শক সামনা সামনি মুখ ফিরে অনুষ্ঠান হয়।

(১২) অভিনেতা-দর্শক কখনো কখনো বাক্যালাপের মাধ্যমে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে।

(১৩) গান সাধারণ বিকালে বা সন্ধ্যায় শুরু হয়।

(১৪) গম্ভীরা আসলে বর্তমানে একশ্রেণীর মিশ্র লোকনাট্য।

(১৫) গম্ভীরা পূর্বে পূজা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হলেও বর্তমানে যেকোনো সময় গাওয়া হয়ে থাকে।

গম্ভীরাগানের কয়েকটি গৌন বিষয়

গম্ভীরা গানের আয়োজক ও দর্শক

প্রথমদিকে মূল গম্ভীরা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বড় তামাসার দিনে গম্ভীরাগান পরিবেশিত হত। সে সময়ের আয়োজক বলতে গ্রামের সমবেত প্রচেষ্টায় বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হত। ফলে কালের গণ্ডী ভেঙে গিয়েছে। এখন কোন ক্লাব, রাজনৈতিক দল অথবা সরকারী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। স্থানীয় এলাকায় পারিশ্রমিক হিসাবে তারা ৫/৭ হাজার টাকা নিলেও কলকাতা বা বাইরে অন্য কোনো জেলা বা রাজ্যে গেলে তার পারিশ্রমিক ২/৩ গুন বেড়ে যায়। সব থেকে কম পারিশ্রমিক পায় সরকারী অনুষ্ঠানে, মাত্র ৩৫০০ টাকা। একটা গম্ভীরা দলের পক্ষে যা খুবই সামান্য।

দর্শক সাধারণত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আলকাপের মত কোনো ধরণের স্থূল রসের পরিবেশন নেই বলে সকলেই অংশগ্রহণ করে। গম্ভীরা গায়কদের দাবি — তারা এই গানের মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার, কুসংস্কার, দূর করাতে চায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝাতে চায়। চায় মানুষের জড়তা কাটিয়ে দিতে। তাই প্রশান্ত শেঠের কলমে আমরা পাই —

"মগজের ছানি কাটাতে গম্ভীরা গাই ... দাদা
মুখ আর মুখোশের ফারাক পষ্ট করে দিতে চাই ... দাদা
মন্দভাল সাদা কালো ঠিকমত চেনাতে চাই ... দাদা।"[৫৪]

ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এতে অংশগ্রহণ করে।

গম্ভীরার পূর্ণাঙ্গ দল

একটি পূর্ণাঙ্গ দল গঠন করতে কমপক্ষে ১২ জনের অংশগ্রহণ দরকার। (১) দলনেতা (২) শিব (৩) চারইয়ারি-তে চারজন (৪) ডুয়েট গাওয়ার সময় কমপক্ষে ১ জন মহিলা। এছাড়া

৫/৬ জন বাজনদার। প্রয়োজনে আরও বেশি অভিনেতার অংশগ্রহণও দরকার হয়ে পড়ে। গম্ভীরার পালা অনুষ্ঠানে আরও অভিনেতার দরকার হয়।

তবে নানা কারনে গম্ভীরার বৈশিষ্ট্যগত আমাদের চোখে পড়ছে বার বার। নিচে গম্ভীরার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারন উল্লেখ করা হলো —

গম্ভীরার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারন

অন্যান্য গবেষকদের মনে আমাদের মতামত নিচে দেওয়া হল —

১) গম্ভীরা যেহেতু যুগের প্রতিবিম্বকে তুলে ধরে তাই সময়ের সাথে সাথে তার বিষয়েরও অভিনবত্ব ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে।

২) গম্ভীরাগানের উৎস যেহেতু কৃষিপ্রধান এলাকা তাই বন্যা নদীভাঙন সহ কর্মসংস্থানের সংকোচনের ফলে আর্থিক অনটন বেড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে গম্ভীরা শিল্পীরা পূর্বের উৎসাহ হারাচ্ছে। ফলে গম্ভীরা গানের তীক্ষ্নতা কমে গেছে।

৩) রাজনৈতিক চাপে বাধ্য হয়ে সত্যি কথা বলতে পারছে না শিল্পীরা বরং তাদের দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য আনুগত্য দেখাতে বেশি ব্যস্ত হওয়ায় সমালোচনার পরিবর্তে গুণকীর্তন করতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দলগুলি।

৪) গণমাধ্যমের বিপুল প্রসারের ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে টিভি, দূরদর্শন, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। ফলে গম্ভীরার আসরে আর তেমন সাড়া ফেলে না।

৫) আগের লন্ঠন বা হ্যাজাক এর পরিবর্তে বিদ্যুতের আমদানী বাড়ায় এবং সহজলভ্য হওয়ায় কোথায় কোথায় আলোকসজ্জার ব্যবহারে চোখে পড়ে।

৬) গম্ভীরার ব্যাপ্তি ও চাহিদা বাড়ার ফলে লোকভাষার ব্যবহার ছেড়ে মান্য ভাষার ব্যবহার বাড়ছে।

৭) পূর্বে মেয়েরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ না করলেও যুগধর্মের চাহিদায় কোন কোন দলে মহিলা অন্তর্ভুক্তি দেখা যাচ্ছে।

৮। বর্তমানে গম্ভীরার গানে তেমন কোনো প্রতিভাধর শিল্পী নেই ফলে অনেক সময় হিন্দী

বাংলা ছায়াছবির গানও গম্ভীরা গানে পরিবেশিত হচ্ছে।

গম্ভীরা শিল্পীদের আর্থসামাজিক চিত্র

গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এর ৭৮ জন শিল্পীদের নিয়ে এক সাক্ষাৎকারের পর যে তথ্য চিত্র আমাদের সামনে উঠে এসেছে তাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র এবার নিচে তুলে ধরা হলো —

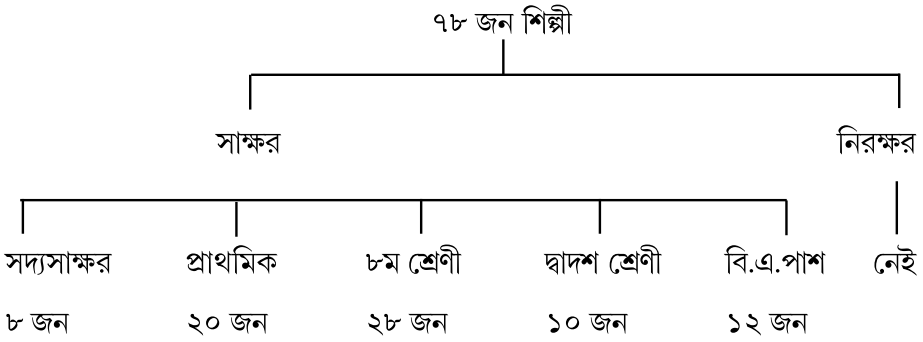

এদের মধ্যে ১২ জন মাত্র মহিলা। বাকি সকলে পুরুষ। এদের মধ্যে কেউ ট্যাক্স কালেকটর, কেউ বেসরকারী সংস্থার কর্মী, কেউ বেসরকারী সমবায় ব্যাঙ্কে চাকরি করেন অস্থায়ী ভাবে। কেউ ব্লক উন্নয় আধিকারিকের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। বেশিরভাগই কৃষিকাজে অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত। কেউ কেউ গৃহশিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। মহিলারা সাধারণত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। গম্ভীরা গানে এদের মাথা পিছু গড় আয় ২৫০/৩০০ টাকা। দল প্রধানই সাধারণত সবার থেকে বেশি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। কোন দলই গম্ভীরা গানের উপর জীবিকা নির্ধারণ করতে সমর্থ নয়। বছরে সর্বাধিক ৫০/৬০ অনুষ্ঠান এরা পেয়ে থাকে কোন কোন দল। অন্যরা আরও কম। কোন কোন দল কেবলমাত্র নিজস্ব অনুষ্ঠানেই গম্ভীরা পরিবেশন করে।

গম্ভীরার অঞ্চল

গম্ভীরা অর্থে শুধুমাত্র শৈব সংস্কৃতি ধরলে তার অঞ্চল বাংলা ছাড়িয়ে বাংলার বাইরে

আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'গম্ভীরা গান'। ফলে তার অঞ্চল মূলত গৌড়বঙ্গ — অর্থাৎ মালদা এবং দুই দিনাজপুর জেলা। এছাড়া গম্ভীরা গানের খ্যাতির জন্য তার চাহিদা এই সীমাকে ছাড়িয়ে গেলেও গম্ভীরাগান মূলত অবিভক্ত মালদার-ই সম্পদ। এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হলেও আমাদের আলোচনার সীমা কেবলমাত্র বর্তমান কালের গৌড়বঙ্গ। ফলে দুই দিনাজপুর এবং মালদাকেই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছি।

গম্ভীরা

তথ্যসূত্র ঃ

১) পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ-১, বরেন্দ্রসাহিত্য পরিষদ, মালদা

২) ঐ

৩) ঐ পৃ- ২

৪) ঐ পৃ- ৩

৫) ঐ

৬) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পৃ- ১, পুস্তকবিপনি, কোল

৭) ঐ

৮) ঐ

৯) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ-১০৯, ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট, কোল

১০) বিশ্বাস শৈলেন্দ্র, সংসদ বাংলা অভিধান, পৃ- ২৪১, সাহিত্যসংসদ, কোল

১১) ঐ

১২) গুপ্ত সতীশ, পাণ্ডুলিপি, আইহো, মালদা, ১৩/৫/১৩

১৩) ঐ

১৪) ড. রায় পুস্পজিৎ, গম্ভীরা - পৃ- ৩, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোল।

১৫) ড. বালা শচীন্দ্র নাথ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা, পৃ- ২৯০, অঞ্জলি, কোল

১৬) চৌধুরী আর্য, উত্তরবঙ্গের মাটি মানুষের গান, পৃ- ৩৭১, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতিকেন্দ্র, কোল

১৭) বর্ধন মনি, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র, পৃ- ৫৬, ঐ

১৮) ড. রায় পুস্পজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃ- ২

১৯) পালিত হরিদাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ১-৩

২০) সরকার বিনয়, The Folk Element is Hindi Culture, Apendix - XII, মালদা সাহিত্যপরিষদ।

২১) ড. পাল ফণী, আলকাপ, ভূমিকাংশ, লোকসংস্কৃতি পরিষদ, মালদা

২২) চক্রবর্তী সাত্যকী, সাক্ষাৎকার, মালদা, ১৮/৮/১৪

২৩) ড. রায় পুস্পজিৎ, গম্ভীরা, প্রস্তাবনা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিলোক, কোল

২৪) ঐ, ভূমিকাংশ

২৫) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, সাক্ষাৎকার, মালদা, ২৮/৭/১৪

২৬) ড. ঘোষ তুষার কান্তি, সাক্ষাৎকার, মালদা, ২৯/৭/১৪

২৭) ড. বালা শচীন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০৬

২৮) দাস শচীকান্ত, গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান, শুভেচ্ছাবার্তা, বইওয়ালা, কোল

২৯) ঐ, পৃ- ৩৩

৩০) বর্ধন মনি, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩

৩১) গোস্বামী অতসীনন্দ, আলকাপ, পৃ- ১৭, প্রাগুক্ত

৩২) বিশ্বাস রতন, উত্তরবঙ্গের লোকগান- পৃ- ৬৭৯, প্রাগুক্ত

৩৩) দাস কল্যাণ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২০৭

৩৪) আহমদ ওয়াকীল, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭১

৩৫) সিং পুলকেন্দু, মধ্যবঙ্গীয় লোকসঙ্গীত- পৃ- ১২৮, প্রাগুক্ত

৩৬) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরার পূনর্বিচার, পৃ- ২১, প্রাগুক্ত

৩৭) পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ- ১১, প্রাগুক্ত

৩৮) ঐ, পৃ- ১১

৩৯) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, প্রাগুক্ত, পৃ- ২০-২১

৪০) ঐ, পৃ- ২০

৪১) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২

৪২) পালিত হরিদাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬

৪৩) ড. রায় পুস্পজিৎ, গম্ভীরা, পৃ- ১৩, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোলকাতা

৪৪) পালিত হরিদাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৬

৪৫) ড. রায় পুস্পজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২

৪৬) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮

৪৭) ঐ

৪৮) ঘোষ রবিশংকর, সাক্ষাৎকার, মালদা, ১২/৬/১৩

৪৯) ঐ

৫০) উমেশ মন্ডল, সাক্ষাৎকার, মহিষপুর, মালদা- ১৪/৭/১৫

৫১) ড. ঘোষ প্রদ্যোত, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮২-৮৩

৫২) মন্ডল অমর, সাক্ষাৎকার, মালদা, ২৭/৯/১৪

৫৩) ক্ষেত্র গবেষণায় প্রাপ্ত, বিশুপন্ডিতের পাণ্ডুলিপি থেকে- ২৮/১১/১৪, মালদা

৫৪) শেঠ প্রশান্ত, ক্ষেত্র সমীক্ষা, কতুবপুর- ৮/৯/১৪